তারিখ 18 JUN 2008

শিক্ষার বিনিময়ে ঋণ

সন্তানকে স্কুলে না পাঠাইলে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে ঋণ পাওয়া যাইবে না মর্মে একটি সরকারি সার্কুলার জারি হইতেছে শীঘ্রই। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হইলে উহা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর উপস্থিতির হার বৃদ্ধিতে সহায়ক হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ইহাকে 'সন্তানের শিক্ষার বিনিময়ে ঋণ' বলা যাইতে পারে। দেশে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইলেও বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার আশাব্যঞ্জক নহে। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে গড়ে শতকরা ২১ ভাগ শিক্ষার্থী স্কুলে যায় না। গ্রামাঞ্চলে এই হার প্রায় ৬০ শতাংশ। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাকে উৎসাহিত করিতে সরকার উপবৃত্তি কার্যক্রম চালু করিলেও এই ক্ষেত্রে সাফল্য উল্লেখ করিবার মতো নহে। স্কুলে ভর্তির সংখ্যা বাড়িলেও ড্রপআউট বা ঝরিয়া পড়িবার হার উচ্চ। অস্বীকার করিবার উপায় নাই, ইহার বড় কারণ দারিদ্র্য। অর্থাৎ দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সহিত ইহার রহিয়াছে সরাসরি সম্পর্ক। পরিবারের আর্থিক চাপ মিটাইতে গিয়া অনেক দরিদ্র অভিভাবকের পক্ষে সন্তানকে স্কুলে পাঠানো সম্ভব হয় না। পরিবারে সহায়তা করিতে সন্তানকে দিয়া করানো হয় বিভিন্ন কাজ। এই বাস্তবতায় দরিদ্র ও পিছাইয়া পড়া পরিবারের জন্য বিশেষ সহায়তা ও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হইলে উহা সন্তানকে স্কুলে পাঠাইতে অভিভাবকদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করিতে পারে। সহজে ঋণ প্রাপ্তি এই ক্ষেত্রে এক ধরনের প্রণোদনা হইতে পারে। সেই প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের মেট-২ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অষ্টম ব্যাচের 'টিম-ই' প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর উপস্থিতি শতভাগ নিশ্চিত করিবার উপর একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। প্রকল্পের জন্য বাছিয়া লওয়া হয় মানিকগঞ্জ জেলার সিঙ্গাইর উপজেলার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে। চার মাসব্যাপী প্রকল্পের কার্যক্রম শেষে দেখা যায়, পূর্বে যেইখানে ওই স্কুলের শতকরা ৪২ ভাগ ছাত্রছাত্রী নিয়মিত স্কুলে যাইত না এবং স্কুলে যাইবার উপযুক্ত অনেক শিশু স্কুলে ভর্তি হয় নাই, সেইখানে এখন ৯৫ শতাংশ শিক্ষার্থী নিয়মিত স্কুলে যায় এবং যাহারা ভর্তির বাহিরে ছিল তাহাদেরও প্রায় সকলে স্কুলে যাইতেছে। পাইলট প্রকল্পটির এইরূপ সাফল্যের পর এই কার্যক্রম সারা দেশে ছড়াইয়া দিবার উদ্যোগ লইয়াছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এই ক্ষেত্রে সরকারিভাবে ঋণ প্রদানের বিষয়টি ছাড়াও যেই সকল এনজিও ঋণ দিয়া থাকে, তাহাদের ঋণ প্রদানের শর্ত হিসাবে সংশ্লিষ্ট পরিবারের সন্তানদের স্কুলে যাইবার বিষয়টি বাধ্যতামূলক করিতে বলা হইবে এই সংক্রান্ত সার্কুলারে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর উপস্থিতির হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপজেলা ও জেলা প্রশাসনকে জবাবদিহিমূলক কিছু দায়িত্বও বাঁধিয়া দেওয়া হইবে। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিতে প্রণীত আইনও করা হইবে কার্যকর। এই সকল পদক্ষেপ যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হইলে দেশে শিক্ষার হার বাড়িতে পারে। তবে এই ক্ষেত্রে তদারকির ব্যবস্থাটা যেন ভালো হয়। দেখিতে হইবে কোন অভিভাবক যেন শুধু ঋণ পাইবার উদ্দেশ্যে সন্তানকে স্কুলে ভর্তি করাইয়া ঋণ পাইবার পর পিছাইয়া না যান। মনিটরিংয়ে দুর্বলতার কারণে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে গতি আসিতেছে না। জনবলে ঘাটতি রহিয়াছে। উহা দূর করিতে হইবে। দারিদ্র্য ব্যতীত আরও কিছু কারণ রহিয়াছে যাহা স্কুলে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার কম হইবার জন্য দায়ী। যেমন অভিভাবকদের সচেতনতার অভাব। শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অভিভাবক সচেতন না হইলে তাহাদের ঋণের সুবিধা দিয়াও কাজ হইবে না। স্কুলে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃদ্ধিতে শিক্ষকদের দায়িত্বও কম নহে। শিক্ষার্থীদের ক্লাসে ধরিয়া রাখিতে না পারা শিক্ষকদেরও ব্যর্থতা। আজকাল শিক্ষকরা এত অধিক প্রাইভেট টিউশনমুখী হইয়া পড়িতেছেন, যাহার কারণে ক্লাসে পাঠদানে মনোনিবেশ করেন না। স্কুলে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি বাড়াইতে শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনি ও গাইডবইকে নিরুৎসাহিত করিবার বিকল্প নাই। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী আজ বুধবার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী উপস্থিতি শতভাগ নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে প্রকল্পের সুপারিশ সারা দেশে কার্যকর করিবার ঘোষণা দিবেন। আমরা এই কার্যক্রমের সাফল্য প্রত্যাশা করি।